পুঁই মাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়েই স্ত্রীকে বলিলেন-একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণ খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে কাটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়িতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমনকি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন-কী হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটা ঘটি? আহ ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন-তুমি মনে-মনে কী ঠাউরেছ বলতে পারো?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল। ইহা -যে ঝড়ের অব্যবহতি পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন-কেন...কী আবার ...কী

অন্নপূর্ণ পূর্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে বলিলেন-দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি-ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জানো না, না কি খোঁজ রাখো না? অতবড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কী করে তা বলতে পারো? গায়ে কী গুজব রটেছে জানো?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- কেন? কী গুজব?

-কী গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগদী দুলে-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গায়ে বাস করা যায় না। সমাজে থাকতে হলে সেইরকম মেনে চলতে হয় ।

সহায়হরি বিক্ষিত হইয়া কী বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণ পূর্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন-একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীবার্দ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না-ও নাকি উলুগু করা মেয়ে-গায়ের কোনো কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না-যাও ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ি বাগদী-বাড়ি উঠে বসে দিন কাটাও ।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন-এই! আমি বলি, না জানি কী ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর!

ওহ!...

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জুলিয়া উঠিলেন-কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশিকিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কী? —আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।... হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন-হল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে বলে বেড়ালে কী হবে, লোকের চোখ নেই?...

পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে।

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি খিড়কী-দুয়ারের একটু এদিকে কী দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন-এসব কী রে? ক্ষেত্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওহ! এ যে···

চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ি ঢুকিল। তাহার হাতে একবোঝা পুইশাক, ডাটাগুলি মোটা ও হলদে হলদে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁইগাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়েদুটির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পুইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড়মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো-বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখদুটো ডাগর ডাগর ও শান্ত । সরু সরু কাচের চুড়িগুলো দু-পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড়মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষান্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল-চিংড়ি মাছ বাবা। গয়া খুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে–তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুন দুটো পয়সা বাকি আছে। আমি বললাম-দাও গয়া পিসি, আমার বাবা কি তোমার দুটো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে-আর এই পুঁই শাকগুলো-ঘাটের ধারের রায় কাকা বললে, নিয়ে যা...কেমন মোটা মোটা...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন-নিয়ে যা, আহা কী অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে...পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু-দিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা... আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন-ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হল না. যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ...ধাড়ী মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ির বাইরে কোথাও পা দিও না! লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে, বিয়ে হলে যে চারছেলের মা হতে খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন, আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ-ফ্যাল বলছি ওসব... ফ্যাল ...

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দুষ্টিতে মা'র দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়ে গেল। অন্নপূর্ণ বকিয়া চলিলেন-যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কির পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো–যা, ফের যদি বাড়ির বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোড়া না করি তো...

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়েছিল। ছোটমেয়েটি কলের পুতুলের মতোন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কি অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোটমেয়ে অতবড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাটা এদিকে-ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত ।

সহায়হরি আমতা আমতা করিয়া বলিতে গেলেন–তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে--তুমি আবার--বরং--

পুঁইশাপের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোটমেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন-না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না– মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর-একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুইশাক ভিক্ষে করে! যা, যা তুই যা, দূর করে বনে দিয়ে আয়. .

সহায়হরি বড়মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখদুটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাহার মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিশ হোক, পুইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না। নিঃশব্দে খিড়কি-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে বাঁধিতে বড়মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল-গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়িতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেত্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল–মা অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের!

বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কি-দোরের আশেপাশে যে ডাটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন– বাকিগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুঁচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুইশাকের তরকারি রাঁধিলেন।
দুপুরবেলা ক্ষেত্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে-ভয়ে চাহিল। দু-একবার এদিকে -ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন-কিরে ক্ষেন্তি, আর-একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়ে এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কী ভাবিয়া অন্নপূর্ণর চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উচু করিয়া চালের বাতায় গোজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন। কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকালবেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সূরে বলিলেন–সেসব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো কেষ্ট মুখুয্যে...স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না, স্বভাব নইলে পাত্রে দেব না করে কী কাণ্ডটাই করলে–অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে, মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে তার কী স্বভাব? রাম বলো, ছ-সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রীয়!—পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশিদূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের.
সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন–এই শ্রাবণে তেরোয়...
–আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলের তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলেই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক, তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিশেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কী জন্যে শুনি? ও তো এরকম উচ্ছ্বগু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা, বিয়ে হওয়াও তা; সাতপাকের যা বাকি, এই তো?...সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব, এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফ্যালো ...পাত্তর! পাত্তর! রাজপুতুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?...গরিব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ি বাগান পুকুর-শুনলাম এবার নাকি কুড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্–রাজার হাল! দুই ভাইয়ের অভাব কি?...
ইতিহাসটা হইতেছে যে, মণিগায়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথাব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্যন্ত বাকি–শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব-যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোনো ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্টপক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক,

পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে সহায়হরি টের পান, পাত্রটি কয়েকমাস পূর্বে নিজের গ্রামে কী একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুন্তকার-বধূর আত্মীয়স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এরকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না-হওয়ায় সহায়হরি সে-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই-পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবিলেবু গাছের ফাক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপনমনে তামাক টানিতেছেন। বড়মেয়ে ক্ষেত্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল– বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল... .

সহায়হরি একবার বাড়ির পাশে ঘাটের পথের দিকে কী জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন– যা শিগগির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি!–কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কী জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্কভৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড বাড়ি একটা লোহার শাবল দুইহাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেত্তি আসিয়া পড়িল–তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তপণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল–ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণ স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন, মুখুয্যে বাড়ির ছোট খুঁকি দুর্গা আসিয়া বলিল-খুড়ীমা মা বলে দিলে, খুড়ীমাকে গিয়ে বল মা ছোঁবে না, তুমি আমার নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে-বাড়ি ও-পাড়ায়–যাইবার পথের বা-ধরে একজায়গায় শেওড়া, বনভাট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন । শীতের সকালে একপ্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হলদে পাখি আমড়াগাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল-খুড়ীমা, খুড়ীমা ঐ যে কেমন পাখিটা–পাখি দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণ কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল.কে যেন কী খুঁড়িতেছে...দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণ সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা খানিকদূর যাইতে-না-যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেত্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন-এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেত্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল–এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব। ক্ষেত্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোলো সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথায় হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন-ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে-কর্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু করে দেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন-বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে খানিক আগে কী করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন-আমি না আমি কখন? কক্ষনো না, এই তো আমি...সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণ পূর্বের মতোই স্থিরদৃষ্টির স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন–চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন ৰোলো না ...আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপণ ঘাটে গিয়েছে আর কী...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কী সব থুপ খুপ্ শব্দ. তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। যেই আবার খানিকদূর গোলাম আবার দেখি শব্দ...তোমার তো ইহকালও নেই, পরকালও নেই, চুরি করতে ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথায় খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উথাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাহার বেশি কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোনো পৌর্বাপর্য সম্বন্ধেও খুঁজিয়া পাওয়া গেলে না।...

আধঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ি চুকিল । সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখ চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণ ডাকিলেন–ক্ষেত্তি এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেত্তির মুখ শুকাইয়া গেল-সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–এই মেটে আলুটা দুজনে মিলে তুলে এনেছিস না?

ক্ষেত্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিয়া লইল, তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণ কড়া সুরে বলিলেন-কথা বলছিল নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কিনা?

ক্ষেত্তি বিপন্ন-চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, উত্তর দিল-হ্যা।

অন্নপূর্ণ তেল-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন-পাজি, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছ মেটে আলু চুরি করতে সোমন্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে ৰাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে যদি গোসাইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন শ্বশুর এসে তোমায় বাচাত? আমার জোটে খাব, না-জোটে না-খাৰ, তা বলে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কী করব, মা?

দু-তিনদিন পরে একদিন বৈকালে ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেত্তি মাকে আসিয়া বলিল-মা মা, দেখবে এসো...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন, ভাঙা পাচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুচি ও বন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেত্তি ছোটবোনটিকে লইয়া সেখানে মহাউৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বন্ধ হইয়া ফাসি হইয়া যাওয়া আসামির মতোন উর্ধ্বমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তার বড়মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণ হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, এখন পুঁইডাটার চারা পোতে কখনো বর্ষাকালে পুততে হয়। এখন যে জল না-পেয়ে মরে যাবে।

ক্ষেত্তি বলিল-কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন-দাখ, হয়তো বেঁচে যেতে পারে। আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হৰি দেখিলেন, তাহার দুই ছোটমেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানে কাঠালতলায় দাড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা বুড়ি করিয়া ক্ষেত্তি শীতে কাঁপতে কাঁপতে মুখুয্যেবাড়ি হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন-হা মা ক্ষেত্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কী হয়? দেখ দিকি, এই শীত ।

-আমি দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো...

–হ্যা, দে মা, এক্ষুনি দে-অসুখ-বিসুখ পাচরকম হতে পারে বুঝলি নে?–

সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেকদিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেত্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ

বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আসেন। ছিড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেত্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না–ক্ষেত্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত ।

পৌষ-সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণ একটা কাসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতেছিলেন-একটি ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেত্তি কুরুনির নিচে একটা কলার পাতা পাড়িয়া এক মালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণ প্রথমে ক্ষেত্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুড়িয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শান্ত্রসন্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেত্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাতপা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণ উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছে, ছোটমেয়ে রাধা হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল-মা, ঐ একটু...

অন্নপূর্ণ বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজোমেয়ে পুটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল-মা, আমায় একটু.

ক্ষেত্তি শুচিবক্সে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ-সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণ বলিলেন-দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেত্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি ...ক্ষেত্তি ক্ষিপ্ত হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণ তাহতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজোমেয়ে পুঁটি বলিল–জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরি করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেত্তি মুখ তুলিয়া বলিল-এ-বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমতন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে । ওবেলা তো পায়েশ, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল-হ্যামা, ক্ষীর নইলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? বেদি বলছিল, ক্ষীরের পূর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণ বেগুনের বোটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেত্তি বলিল-খেদির ওইসব কথা! খেদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পূর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হল সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ি দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দুখানা পাটিসাপটা খেতে দিলে। ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ। আর মা'র পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়। পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়।

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল-মা, নারকেল-কোরা একটু নেৰ?

অন্নপূর্ণ বলিলেন-নে, কিন্তু এখানে বসে খাসনে। মুখ থেকে পড়বে না কী হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেস্তি নারিকেলের মাথায় একথাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দুরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণস্বরূপ হয়, তবে ক্ষেত্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণ বলিলেন-ওরে, তোরা সব এক-এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি। গরম গরম দিই। ক্ষেত্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেত্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ-প্রস্তাব-যে খুব মনঃপূত হইল না, তা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল-মা, বড়দি পিঠেই থাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোটমেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেত্তি তখনও থাইতেছে! সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণ দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন-ক্ষেত্তি আর নিবি?...ক্ষেত্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণ তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেত্তির মুখচোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল–বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু...সে পুনরায় খাইতে লাগিল ।

অন্নপূর্ণ হাতা, যুক্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তার একটু শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে-মনে ভাবিলেন-ক্ষেত্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজকর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টু-শব্দটি মুখে নেই, উচু কথা কখনো কেউ শোনেনি... বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ঘটকালিতে ক্ষেত্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথম এখানে অন্নপূর্ণ আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ি, সিলেট চুন ও ইটের ব্যবসায়ে দু-পয়সা নাকি করিয়াছে–এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুরগতনা কিনা।

জামাইএর বয়স আক্তু বেশি, প্রথমে অন্নপুরনা একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেত্তির মনে কষ্ট হয়, এইজন্য দিলেন-চোখের জলে তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিন্তু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ির বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পালকি একবার নামাইল। অন্নপূর্ণ চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রঙের মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেত্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলির আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।..তাহার এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ, একটু অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাইয়াছে তার বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেত্তিকে কি অপরের ঠিক বুঝিবে?...
যাইবার সময় ক্ষেত্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে, সান্তনার সুরে বলিয়াছিল-মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও...দুটো মাস তো...
ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন–তোমার বাবা তোর বাড়ি যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক–তবে তো...

ক্ষেত্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল-না, যাবে না বৈকি?...দেখো তো, কেমন না যান।
ফাগুন-চৈত্রমাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে-দেওয়া আমস তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত...তাহার অনাচারী লোভ মেয়েটি আজ বাড়িতে নাই যে কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতোন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে–মা, বলব একটা কথা, এই কোণটা ছিরে আক টু খাণী
এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছে। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন-ও তুমি ধরে রাখো, ওরকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকেও ওর চেয়ে ভালো কী আর জুটবে?
বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উরু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুচি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিরৈন-নাহ, সব তো আর.তাছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব ...তোমার মেয়েটির হয়েছিল কী?
সহায়হৰি হুকটায় পাঁচ-ছটি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন–বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কী দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।
–তাপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে-ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম করেই ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা! মেয়ের নানা নিন্দে খাই..আরও কত কী পৌষমাসে দেখতে গেলাম–মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?
সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দুজনের কোনো কথা শোনা গেল না।
অল্পকক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন-তারপর?
-আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষমাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে-অবস্থা করেছে। শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না-জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এরকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পোষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু-হাতে!..পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন-বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ-অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে–আজই না হয় আমি.প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কসুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসুচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।
-তারপর ফাগুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার-বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোজ পেয়েছিল–তারই ওখানে ফেরে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...
-দেখতে পাওনি?
-নাহ এমনি চামার-গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে।..যাক, তা চলো, যাওয়া যাক, ৰেল গেল।...চার কি ঠিক করলে.পিপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না...
তারপর কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন । এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাহারা কখনো জ্ঞানে দেখেন নাই।
সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণ সরুচাকলি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারি করিতেছেন। পুটি ও রাধা উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধা বলিতেছে–আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘর করে ফেললে কেন ।
পুঁটি বলিল–আচ্ছা মাওতে একটু নুন দিলে হয় না?
-ওমা দেখ মা, রাধার দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে..
অন্নপূর্ণ বলিয়া উঠিলেন–সরে এসে বসে না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এদিকে আয় ।
গোলা তৈয়ারি হইয়া গেল,...খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণ গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন...দেখিতে দেখিতে মিঠে-আঁচে পিঠা । টোপরের মতোন ফুলিয়া উঠিল।

পুঁটি বলিল–মা দাও, প্রথম পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচো লতার থোলো থেলো শাদা ফুলের মধ্যে জোছনা আটকিয়া রহিয়াছে।...
পুঁটি ও রাধা খিড়কি-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খসখস শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল । পুঁটি পিঠাখানা জোর করিয়া ছুড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাশবনের নিস্তব্ধতায় হয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কিদরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।
পুটি ও রাধা ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন-দিল্লি?
পুঁটি বলিল–হ্যা মা তুমি আর-বছর যেখানে থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম
তারপর সে-রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশি।...জোছনার আলোয় বাড়ির ফিচনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠক-র-র-ল্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল-দিদি বড় ভালোবাসত...
তিনজনেই খালিনক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনাআপনি উঠানের এককোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল.যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের-হাত-পোতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া

বাড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া, কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাছা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!

লেখক পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ - ১লা নভেম্বর, ১৯৫০) এক জন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তিনি মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত তাঁর সব চেয়ে বেশি পরিচিত উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতী ও অশনি সংকেত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের পাশাপাশি বিভূতিভূষণ প্রায় ২০টি গল্পগ্রন্থ, কয়েকটি কিশোরপাঠ্য উপন্যাস ও কয়েকটি ভ্রমণকাহিনি এবং দিনলিপিও রচনা করেন। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ১৯৫১ সালে ইছামতী উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।

বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী ঘোষপাড়া – সুরারিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর গ্রামে। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। পাণ্ডিত্য এবং কথকতার জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মাতা মৃণালিনী দেবী। পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে বিভূতিভূষণ ছিলেন সবার বড়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) প্রবাসী পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় উপেক্ষিতা নামক গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ভাগলপুরে কাজ করার সময় ১৯২৫ সালে তিনি পথের পাঁচালী রচনা শুরু করেন। এই বই লেখার কাজ শেষ হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। এটিই বিভূতিভূষণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা। এর মাধ্যমেই তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এর পর অপরাজিত রচনা করেন যা পথের পাঁচালীরই পরবর্তী অংশ। উভয় উপন্যাসেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালী উপন্যাসের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপদানের মাধ্যমে তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা করেছিলেন। এই চলচ্চিত্রও প্রচুর দেশি, বিদেশি পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছিল। এর পর অপরাজিত এবং অশনি সংকেত উপন্যাস দু’টি নিয়েও সত্যজিৎ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এর সব গুলোই বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। পথের পাঁচালী উপন্যাসটি ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ

সংসার, যাপিত জীবন, সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সহায়হরির সাথে বাস্তববাদী, নীতিনৈতিকতায় বলিষ্ট, কঠোর অথচ মমতাময়ী একজন নারীর চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় পুঁই মাচা গল্পে যে সমাজের কথা বলেছেন সে সমাজে বিষফোড়ার মতো স্থান করে নিয়েছে বাল্যবিবাহ আর যৌতুক প্রথা। গল্পে তিনি জীবনের জটিল মনস্তত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা দাড় করাননি বরং দিনহীন একটি পরিবারের স্বাভাবিক করুন কাহিনী সহজ সরল ভাষায় বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র এঁকেছেন।

স্ত্রী এবং তিন মেয়েকে নিয়ে সহায়হরির অভাব অনটনের সংসার। বড় মেয়ের বয়স তেরতে পড়েছে। এ বয়সেও বিয়ে না হওয়ায় তার স্ত্রীর দুঃশ্চিন্তার শেষ নেই। মেয়ের বিয়ে না হওয়ায় তাকে যে একঘরে করার

কথা হচ্ছে সে উদ্বেগের কথা সে তার স্বামীকে জানায় কিন্তু সহায়হরির সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সংসারের প্রতি তার এই উদাসিনতার রাগ গিয়ে পড়ে মেয়েদের উপর।

এক বিকেলে বড় মেয়ে কিছু পুঁই শাক আর চিংড়ি মাছ চেয়ে চিনতে নিয়ে আসে। বড় মেয়ের ক্ষেন্তির পছন্দ কুচো চিংড়ি দিয়ে পুঁইশাক। কিন্তু মায়ের রাগে তোড়ে তা ফেলে দিয়ে আসতে হয়। পরে বাড়িতে যখন কেই থাকে না তখন তার মা ফেলে দেয়া পুঁইশাক কুড়িয়ে নিয়ে এসে রাঁধে। দুপুরে খেতে বসে পুইশাক পাতে দেখে ক্ষেন্তির চোখ ছলছল করে ওঠে। পুঁইশাক ক্ষেন্তির এতো পছন্দের ছিলো যে ঘরের কোনায় সে লাগিয়ে রাখে পুঁইশাক। মাচা ভর্তি সে পুঁইশাক লকলক করে বাড়তে থাকে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ঘটকালিতে ক্ষেত্তির বিবাহ হয়ে যায়। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হবে না । দীনহীন সহায়হরি যৌতুকের টাকা ধীরে ধীরে শোধ করছিলো। কিন্তু টাকা না পেয়ে ক্ষেন্তির উপর অত্যাচার বাড়তে থাকে। এরমাঝে মেয়ের বসন্ত হলে গা থেকে সোনা গয়না খুলে তাকে ফেলে রেখে যায় পাশেই অপরিচিত এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। সে বাড়ীতেই মৃত্যু হয় ক্ষেন্তির।

এই হলো পুঁইমাচা গল্পের কাহিনী। আহামরি কোন গল্প নয়, তবে বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ভাষায়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চিত্রণে এমন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন যে সাধারণ একটি কাহিনী অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

"স্ত্রী অন্নপূর্ণ খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে কাটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র. . ."

এটি গ্রাম বাংলার শীতের সকালের চিরপরিচিত চিত্র, তা মনে হয় কাউকে এর চেয়ে বেশি করে বর্ণনা দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। শুধু দুলাইনের একটি বর্ণনায় কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এ সকালটি।

বিভুতিভুষণ বন্দোপাধ্যায় যে সময়ে গল্পটি লিখেছিলেন সে সময়ে বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকপ্রথা ছিলো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সঙ্গতকারণেই এটি গল্পের মুল বিষয়, তবে মুল বিষয়টি বলতে গিয়ে বিভুতিভুষণ বন্দোপাধ্যায় বেশি সময় বা শব্দ ব্যবহার করেন নি। ক্ষেন্তির উপর শ্বশুর বাড়ীর নির্যাতন , যৌতুক ও তার মৃত্যুর বিষয়টি প্রতিবেশি বিষ্ণু সরকারের সাথে আলাপচারিতায় স্বল্পকথায় বর্ণনা করেছেন -

"আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষমাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে-অবস্থা করেছে। শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না-জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এরকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পোষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু-হাতে!"

"মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

–তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে-ক্রমে দিচ্ছি। "

আর প্রিয় মেয়েটির মৃত্য ঘটনা এমনভাবে তুলে ধরেছেন অমনযোগী পাঠকের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে-

-তারপর ফাগুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার-বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল–তারই ওখানে ফেরে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...

গল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণ। নীতি নৈতিকতা, কঠোরতা, কোমলতা, মমতাময়ী মা এসবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এ চরিত্রে। মুলত এ চরিত্রটির কারনেই গল্পটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

"স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল। ইহা -যে ঝড়ের অব্যবহতি পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। "

মুখুয্যে বাড়ী যাওয়ার পথে জঙ্গলের ভিতর থেকে পনের ষোল সের ওজনের একটি মেটে আলু চুরি করে তুলে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে সহায়হরি যখন উঠোনে ফেললো তখন তার স্ত্রীর প্রশ্নের কোন জবাই সে দিতে পারলো না। তার স্ত্রী তখন বললেন–"চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন ৰোলো না ...আমি সব জানি।" - "তোমার তো ইহকালও নেই, পরকালও নেই, চুরি করতে ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথায় খাওয়া কিসের জন্যে? "

মেয়ের বিয়ে নিয়ে সহায়হরির স্ত্রী যখন তার স্বামীর সাথে বাকবিতন্ডা করছিলেন তখন ক্ষেন্তি ও তার দুইবোন মাথায় করে একগোছা পাকা পুঁইশাক মাথায় করে ঘরে ঢুকলো। সহায়হরি আনন্দিত হলেও অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন-"নিয়ে যা, আহা কী অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে...পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু-দিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা... আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন-ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হল না." ক্ষেন্তির চোখ ছলছল করে উঠলো। ছোট মেয়েটি তা নিয়ে ফেলে দিয়ে আসলো। দুপুরে রাঁধতে গিয়ে ক্ষেন্তির পুঁইশাক পছন্দের কথা তার মনে হলো। বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কি-দোরের আশেপাশে যে ডাটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন– বাকিগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুঁচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুইশাকের তরকারি রাঁধিলেন। দুপুরবেলা ক্ষেত্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিষ্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে-ভয়ে চাহিল

গল্পের সবচেয়ে করুন আর হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা আছে শেষের দুটি প্যারায়। গল্পটির ভিন্নরকম আমেজ এবং পুঁই মাচা গল্পটির নামকরণের বিষয়টি পাঠক এখানে এসেই বুঝতে পারে ।

তারপর সে-রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশি।...জোছনার আলোয় বাড়ির ফিচনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠক-র-র-ল্

শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল-দিদি বড় ভালোবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনাআপনি উঠানের এককোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল.যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের-হাত-পোতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া, কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাছা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!..

পুঁই মাচার এই লাবণ্যে ভরপুর কচি সবুজ ডগাগুলোর মাঝে তিনজনই যেন ক্ষেন্তির অবয়ব খুঁজে পায়। এমন ডাগর ডাগর মেয়েটির অকাল প্রয়ানের কথা স্মরণ করে তিনজনই নিবাক বসে থাকে।

গল্পটির সবচেয়ে বড় সার্থকতা এর মেদহীন বর্ণনা। দিনহীন একটি পরিবারের স্বাভাবিক জীবনযাপন আর কথপোকথনের মাধ্যমে সে সময়ের চিত্র, সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষিতে করুন একটি কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের সমাজ চিত্রনের এই দক্ষতা আর কারো মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোঃ রায়হান খান
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: raihankhancs@gmail.com